أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 103) www.motaher21.net

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِه

" তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে, তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর,"

" If you are in doubt, then produce a Surah."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৩

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِیْ رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ

আর যে কিতাবটি আমি আমার বান্দার ওপর নাযিল করেছি সেটি আমার কিনা- এ ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করে থাকো তাহলে তার মতো একটি সূরা তৈরি করে আনো এবং নিজেদের সমস্ত সমর্থক গোষ্ঠীকে ডেকে আনো – এক আল্লাহকে ছাড়া আর যার যার চাও তার সাহায্য নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে এ কাজটি করে দেখাও।

২৩ নং আয়াতের তাফসীর:

(شُهَداء) শব্দের ব্যাখ্যা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতে, (اَعْوَانُكُمْ) বা সাহায্যকারীগণ। অর্থাৎ এমন সম্প্রদায় আহবান কর যারা তোমাদেরকে এ ব্যপারে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে। আবু মালেক বলেন, এর অর্থ, (شُرَكَاءَكُمْ) তোমাদের অংশীদারদেরকে বা যাদেরকে তোমরা আমার সাথে শরীক করছ সে শরীকদেরকে আহবান করে দেখ তারা কি এর অনুরূপ কোন সূরা আনতে পারে কি না? মুজাহিদ বলেন, (شُهَدَاء) শব্দটি

এখানে সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এমন লোকদের আহবান করে নিয়ে আস যারা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য হবে যে, আল্লাহ্‌র কালামের বিপরীতে যা নিয়ে আসবে তা আল্লাহ্‌র কালামের মত হয়েছে। ভাষাবিদদের সাক্ষ্য এর সাথে যোগ করে দাও। পবিত্র কুরআনে এ চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন স্থানে এসেছে। মক্কী সূরায়ও এমন চ্যালেঞ্জ এসেছিল। বলা হয়েছে, "এ কুরআন আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো রচনা হওয়া সম্ভব নয়। বরং এর আগে যা নাযিল হয়েছে এটা তার সমর্থক এবং আল কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। তারা কি বলে, তিনি এটা রচনা করেছেন? বলুন, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও " [সূরা ইউনুস ৩৭-৩৮] তারপর মদীনায় নাযিল হওয়া সূরাসমূহেও এ ধরনের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যেমন, সূরা আলবাকারাহ এর আলোচ্য আয়াত [ইবনে কাসীর]

কুরআন নিয়ে যারাই গবেষণা করেছেন, তারা একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এর ভাষাগত বাহ্যিক রূপ ও মর্মগত আত্মিক স্বরূপ উভয় দিক দিয়েই এটা অতুলনীয়। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "আলিফ-লাম-রা, এ কিতাব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের কাছ থেকে; এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত"। [সূরা হুদঃ ১]

সুতরাং কুরআনের ভাষা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ও তার মর্ম সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক। ভাব ও ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই তা অতুলনীয় ও বিস্ময়কর। সব সৃষ্টিজগত তার সমকক্ষতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করেছে। তাতে একদিকে যেমন অতীতের ইতিহাস উপযুক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলীও সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। ন্যায় অন্যায় ও ভালো মন্দ সম্পর্কিত সব কিছুই সুনিপুণভাবে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা করলেন, "সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রব-এর বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"। [সূরা আলআন'আম: ১১৫] অর্থাৎ যে সমস্ত সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত। আর যে সমস্ত বিধান দিয়েছেন বিধানদাতা হিসেবে সেগুলোর ন্যায়পরায়ণতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এর প্রতিটি বিষয়ই সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি ও পথের দিশারী। এতে কোন ধারণাপ্রসূত কথা, রূপকথা কিংবা কাল্পনিক গালগল্প ও মিথ্যাচার যা সাধারণত কবিদের কাব্যে পাওয়া যায়, এতে এর বিন্দুমাত্র ছোঁয়াও নেই।

কুরআনের মজীদের পুরোটাই হচ্ছে উচ্চাঙ্গের কথামালা। অনন্য ভাষাশৈলীতা এবং হৃদয়স্পর্শী উপমায় ভরপুর। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীরাই কেবল কুরআনের ভাষারীতি ও ভাব সম্পদের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম। কুরআন যখন কোন খবর প্রকাশ করে, হোক তা বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত, আবার তা যদি একবারের জায়গায় বারবারও বলা হয়, তথাপি তার স্বাদ ও মাধুর্যে বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না। যতই পাঠ করবে ততই যেন অজানা এক স্বাদে মন উত্তরোত্তর উদ্বেলিত হয়েই চলবে। তার বারবার পাঠ করলে যেমন সাধারণ পাঠকের ধৈর্যচুতি ঘটে না। তেমনি অসাধারণ পাঠকরাও অনগ্রহ প্রকাশ করেন না। আল-কুরআনের ভীতি প্রদর্শনমূলক আয়াত ও কঠোর সতর্কবাণী ভালো করে অনুধাবন করলে কঠিন মানুষ তো দূরের কথা পাহাড় পর্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে থাকে।

অনুরূপভাবে তার আশ্বাসবাণী ও পুরস্কার বিবরণ দেখলে ও হৃদয়ঙ্গম করলে অন্ধ মনের বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায়, অবরুদ্ধ শ্রবণশক্তি প্রত্যাশার পদ-ধ্বনি শুনতে পায়। আর মৃত মন ইসলামের অমিত শরবত পানের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠে। এসব কিছু মিলে অজান্তে হৃদয়ে শান্তিধাম জান্নাতের প্রতি আগ্রহ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আর মহান আল্লাহ্‌র আরশের কাছে থাকার তীব্র আকাংখা জাগ্রত হয়। এ কুরআনের বিষয় বৈচিত্র আশ্চর্যজনক। ভাষার অলংকারের ঔজ্জ্বল্য, নসীহতের প্রাচুর্য, হাজারো যুক্তি প্রমাণ ও তত্ত্বজ্ঞানের আধিক্য কুরআনকে গ্রন্থ জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। বিধিনিষেধের বাণীসমূহকে অত্যন্ত ন্যায়ানুগ, কল্যাণকর, আকর্ষণীয় ও প্রভাবময় করা হয়েছে। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অনেক প্রাচীন মনীষী বলেছেন, (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) শোনার সাথে সাথে মনোযোগের সাথে কান পেতে পরবর্তী বক্তব্য শোন। কারণ, তারপর হয়ত কোন কল্যাণের পথে আহবান থাকবে, না হয় কোন অকল্যাণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ ঘোষিত হবে। [ইবন কাসীর]

আর যদি আল-কুরআনে কিয়ামতের মাঠের ভয়াবহ চিত্র, চির সুখের জান্নাতের নেয়ামতরাজী, জাহান্নামের চিরন্তন দূর্ভোগের বিবরণ, নেককারদের লোভনীয় পুরস্কার আর গুনাহগারদের নানা রকম ভয়াবহ শাস্তি, দুনিয়ার সম্পদ ও সুখ সম্ভোগের অসারতা ও পারলৌকিক জীবনের সুখ সম্ভোগের অবিনশ্বরতা সংক্রান্ত আলোচনার দিকে দৃষ্টি দেয়া যায় তবে তা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও কল্যাণমূলক আলোচনায় সমৃদ্ধ। এসব বর্ণনা মানুষকে বার বার ন্যায়ের পথে উদ্বুদ্ধ করে, মনকে ভয়ে বিগলিত করে এবং শয়তানের প্ররোচণায় জমানো অন্তরের কালি ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। আল-কুরআনের এ ধরনের অবিস্মরণীয় ও আশ্চর্যজনক মু'জিযার কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মানুষের ঈমান আনার জন্য প্রত্যেক নবীকে কিছু কিছু মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ওহী হচ্ছে আমার মু'জিযা। আমি আশা করি কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীর তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা অধিক হবে। " [বুখারী ৪৯৮১, মুসলিম: ১৫২] কারণ, প্রত্যেক নবীর মু'জিযা তাদের ইন্তেকালের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কুরআনুল কারম কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় বর্তমান থাকবে। সর্বকালের মানুষের কাছে অবিসংবাদিত হিসেবে থাকবে।

ইতিপূর্বে মক্কায় কয়েকবার এ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছিল, যদি তোমরা এ কুরআনকে মানুষের রচনা মনে করে থাকো তাহলে এর সমমানের কোন বাণী রচনা করে আনো। এখন মদীনায় এসে আবার সেই একই চ্যালেঞ্জের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। (দেখুন সূরা ইউনূস ৩৮ আয়াত , সূরা হুদ ১৩ আয়াত , সূরা বনী ইসরাঈল ৮৮ আয়াত এবং সূরা তূর ৩৩-৩৪ আয়াত) ।

নবী ও নাবুওয়াত সত্য

তাওহীদের পর এখন নাবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ 'আমি যে পবিত্র কুর'আন আমার বিশিষ্ট বান্দা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ করেছি, তাকে যদি তোমরা আমার বাণী বলে বিশ্বাস না করো, তাহলে তোমরা ও তোমাদের সাহায্যকারীরা সবাই মিলে পূর্ণ কুর'আন তো নয়ই, বরং শুধুমাত্র তার একটি সূরার মতো সূরাহ আনয়ন করো। তোমরা তো তা করতে কখনো সক্ষম হবে না। তাহলে তা যে মহান আল্লাহর বাণী এতে সন্দেহ করছো কেন?'

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন شُهَدَاءُ-এর ভাবার্থ হচ্ছে সাহায্যকারী। (তাফসীর তাবারী ১/৩৭৬) আবূ মালিক (রাঃ) বলেনঃ এর অর্থ হচ্ছে অংশীদার, যারা তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতো। তাহলে ভাবার্থ হলো এইঃ ‘যাদেরকে তোমরা পূজনীয়রূপে স্বীকার করছো তাদেরকেও ডাকো এবং তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় হলেও কুর’আনের সূরার মতো একটি সূরাহ্ রচনা করো।’ (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম, ১/৮৪)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তোমরা তোমাদের শাসনকর্তা এবং বাকপটু ও বাগ্মীদের নিকট হতেও সাহায্য নিয়ে নাও। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম, ১/৮৫)

একটি চ্যালেঞ্জ

কুর’আনুল হাকীমের এই মু‘জিযার প্রকাশ এবং রীতির বাণী কয়েক স্থানে আছে। সূরাহ্ কাসাসে আছেঃ

﴿قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَاۤ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾

বলোঃ তোমরা সত্যবাদী হলে মহান আল্লাহর নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন করো, যে পথ নির্দেশ এতদুভয় তথা কুর’আন ও তাওরাত হতে উৎকৃষ্টতর হবে, আমি সেই কিতাব অনুসরণ করবো। (২৮ নং সূরাহ্ কাসাস, আয়াত নং ৪৯) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ

﴿قُلْ لَّىِٕنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا﴾

বলোঃ যদি এই কুর’আনের অনুরূপ কুর’আন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুর’আন আনয়ন করতে পারবে না। (১৭ নং সূরাহ্ ইসরাহ, আয়াত নং ৮৮) অন্য এক সূরায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾

‘না কি তারা বলে যে, তা সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাওঃ তাহলে তোমরাও এর অনুরূপ রচিত দশটি সূরাহ্ আনয়ন করো এবং নিজ সাহায্যার্থে যে সমস্ত গাইরুল্লাহকে ডাকতে পারো ডেকে আনো, যদি

তোমরা সত্যবাদী হও।' (১১ নং সূরাহ্ হুদ, আয়াত নং ১৩।১১ নং সূরাহ্ হুদ, আয়াত নং ১৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝۳۷ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ١ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾

আর এ কল্পনা প্রসূত নয় যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, এটা তো সেই কিতাবের প্রমাণকারী যা এর পূর্বে নাযিল হয়েছে এবং আবশ্যকীয় বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী এবং এতে কোন সন্দেহ নেই এটি বিশ্বের রবের পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। তারা কি এরূপ বলে যে, এটি তার নবীর স্বরচিত? তুমি বলে দাওঃ তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাহ্ আনয়ন করো এবং গাইরুল্লাহ হতে যাকে ইচ্ছা ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১০ নং সূরাহ্ ইউনুস, আয়াত নং ৩৭-৩৮) এ সমস্ত আয়াত তো মাক্কা মুর্কারামায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাক্কাবাসীকে এর মুকাবিলায় অসমর্থ সাব্যস্ত করে মাদীনায়ও এ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, যেমন ওপরের আয়াত। مِثْلِهِ-এর সর্বনামটিকে কেউ কেউ কুর'আনের দিকে ফিরিয়েছেন। অর্থাৎ কুর'আনের মতো কোন একটি সূরাহ্ রচনা করো। কেউ কেউ সর্বনামটি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে ফিরিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর মতো কোন নিরক্ষর লোক এরূপ হতেই পারে না যে, লেখা-পড়া কিছু না জেনেও এমন বাণী রচনা করতে পারে যার মতো বাণী কারো দ্বারা রচিত হরে পারে না। কিন্তু প্রথম মতটিই সঠিক।

মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইবনু 'আব্বাস (রাঃ), ইবনু 'উমার (রাঃ), ইবনু মাস'ঊদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং অধিকাংশ চিন্তাবিদের এটাই অভিমত। ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (রহঃ) এবং ইমাম রাযী (রহঃ)-ও এই মত পছন্দ করেছেন। এটিকে প্রাধান্য দেয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমটি এই যে, এতে সবারই প্রতি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। একত্রিত করেও এবং পৃথক পৃথক করেও, সে নিরক্ষরই হোক বা আহলে কিতাব ও শিক্ষিত লোকই হোক, এতে এই মু'জিযার পূর্ণতা রয়েছে এবং শুধুমাত্র অশিক্ষিত লোকদেরকে অপারগ করা অপেক্ষা এতে বেশি গুরুত্ব এসেছে। আবার দশটি সূরাহ্ বলা এবং এটা আনতে না পারার ভবিষ্যদ্বাণী করাও এটাই প্রমাণ করছে যে, এর ভাবার্থ কুর'আনই হবে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যক্তিত্ব নয়। সুতরাং এই সাধারণ ঘোষণা, যা বার বার করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এই ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে যে, এরা এর ওপর সক্ষম নয়। এ ঘোষণা একবার মাক্কায় করা হয়েছে এবং পরে মাদীনায়ও এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে। বিশেষ করে ঐসব লোক, যাদের মাতৃভাষা 'আরবী ছিলো এবং নিজেদের বাকপটুতা ও বাগ্মীতার জন্য গর্ববোধ করতো তারা সবাই এর মুকাবিলা করতে অসমর্থ হয়েছিলো। তারা পূর্ণ কুর'আনের উত্তর দিতে পারেনি।' দশটি সূরাহ্ও নয়, এমনকি একটি আয়াতেরও উত্তর দিতে সর্মথ হয়নি। সুতরাং পবিত্র কুর'আনের একটি মু'জিযাহ তো এই যে, তারা এর মতো একটি ছোট সূরাহ্ও রচনা করতে পারেনি।

দ্বিতীয় মু'জিযাহ

কুর’আনুল হাকীমের দ্বিতীয় মু‘জিযাহ এই যে, তারা কখনো এর মত কিছুই রচনা করতে পারবে না যদিও তারা সবাই একত্রিত হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করে। মহান আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেলো। সেই যুগেও কারো সাহস হয়নি, তার পরে আজ পর্যন্তও হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত কারো সাহস হবে না। আর এটা হবেই বা কিরূপে? যেভাবে মহান আল্লাহর সত্বা অতুলনীয়, তাঁর বাণীও তদ্রুপ অতুলনীয়। যেহেতু কুর’আন হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা মহান মহান আল্লাহর সৃষ্টি, তাই অন্যরা কিভাবে এরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, যাদেরকে মহান আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন? যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের বাক্য কি করে স্রষ্টার সমতুল্য হতে পারে ?

কুর’আনের মু‘জিযাহ

কুর’আনুল কারীমকে এক নযর দেখলেই তার প্রকাশ্য ও গোপনীয়, শাব্দিক ও অর্থগত সব কিছুই এমনভাবে প্রকাশ পায় যে, তা সৃষ্টজীবের শক্তির বাইরে। স্বয়ং বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُه ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ﴾

এ কুর’আন এমন কিতাব, যার আয়াতগুলো প্রমাণাদি দ্বারা মযবূত করা হয়েছে। তারপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। (১১ নং সূরাহ্ হুদ, আয়াত নং ১)

সুতরাং শব্দ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ বিশ্লেষিত কিংবা শব্দ বিশ্লেষিত এবং অর্থ সংক্ষিপ্ত। কাজেই কুর’আন স্বীয় শব্দ ও রচনায় অতুলনীয়, এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সারা দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে অপারগ ও অক্ষম। পূর্ব যুগের যেসব সংবাদ দুনিয়ার অজানা ছিলো তা হুবহু এই পবিত্র কালামে বর্ণিত হয়েছে, আগামীতে যা ঘটবে তারও আলোচনা রয়েছে এবং অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে সমস্ত ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ রয়েছে। মহান আল্লাহ সত্যই বলেনঃ

﴿وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّ عَدْلًا﴾

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। (৬ নং সূরাহ্ আন‘আম, আয়াত নং ১১৫) এই পবিত্র কুর’আন পুরোটাই সত্য, সত্যবাদিতা, সুবিচার এবং হিদায়াতে ভরপুর।

কুর’আন কাব্য নয়

পবিত্র কুর'আনে কোন আজে বাজে কথা, ক্রীড়া-কৌতুক এবং মিথ্যা অপবাদ নেই, যা সাধারণত কবিদের কবিতায় পাওয়া যায়। বরং তাদের কবিতার কদর ও মূল্য তারই ওপর নির্ভর করে। বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে যে, أَعْذَبُه أَكْذَبه অর্থাৎ যা খুব বেশি মিথ্যা, তা খুব বেশি সুস্বাদু। লম্বা চওড়া জোরালো প্রশংসামূলক কবিতাগুলোকে দেখা যায় যে, তা অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা মিশ্রিত। তাতে থাকবে নারীদের প্রশংসা ও সৌন্দর্য বর্ণনাময় ঘোড়া ও মদের প্রশংসা, কোন মানুষের অতিরিক্ত প্রশংসা, উষ্ট্রীসমূহের ভূষণ ও সাজ-সজ্জা, বীরত্বের অতিরঞ্জিত গীত, যুদ্ধের চালবাজী কিংবা আতঙ্ক-আশংকার কাল্পনিক দৃশ্য। এতে না আছে কোন দুনিয়ার উপকার, না আছে কোন দ্বীনের উপকার। এতে শুধু কবিতার বাকপটুতা ও কথা-শিল্প প্রকাশ পায়। চরিত্রের ওপরেও তার কোন ভালো প্রভাব পড়ে না। 'আমলের ওপরেও না। সম্পূর্ণ কবিতার মধ্যে দু' একটি ভালো ছন্দ হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু বাকী সবগুলোই আজে বাজে কথায় ভর্তি থাকে।

পক্ষান্তরে কুর'আনুল হাকীমের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তার এক একটি শব্দ ভাষা-মাধুর্যে দীন ও দুনিয়ার উপকারে এবং মঙ্গল ও কল্যাণে ভরপুর। আবার বাক্যের বিন্যাস ও সৌন্দর্য, শব্দের গাঁথুনী, রচনার গঠন শৈলী অর্থের সুস্পষ্টতা এবং বিষয়ের পবিত্রতা যেন সোনায় সোহাগা। তার সংবাদের আস্বাদন, বর্ণনাকৃত ঘটনাবলীর সরলতা, সংক্ষেপণ, উচ্চ আদর্শ ও এর বিশ্লেষণ মু'জিযার প্রাণ। এর কোন কিছুর পুনরাবৃত্তি দ্বিগুণ স্বাদ দিয়ে বিরক্তি আসবেনা। স্বাদ গ্রহণ করতে থাকলে সব সময় নতুন স্বাদ পাওয়া যাবে। বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে থাকলে শেষ হবে না। এটা একমাত্র কুর'আনুল হাকীমের বৈশিষ্ট্য। এর ভয় প্রদর্শন, ধমক এবং শাস্তির বর্ণনা মযবূত পাহাড়কেও নাড়িয়ে দেয়, মানুষের অন্তর তো কি ছার! এর অঙ্গীকার, সুসংবাদ, দান ও অনুগ্রহের বর্ণনা অন্তরের শুষ্ক কুঁড়ির মুখ খুলে দেয়। এটা ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার প্রশমিত আবেগের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এবং জান্নাত ও আরামের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য চোখের সামনে উপস্থাপনকারী। এতে মন আনন্দিত হয় এবং চক্ষু খুলে যায়। এতে আগ্রহ উৎপাদক ঘোষণা হচ্ছেঃ

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِیَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْیُنٍ١ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ﴾

'কেউই জানে না, তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি কি প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।' (৩২ নং সূরাহ্ সাজদাহ, আয়াত নং ১৭)

আরো বলা হচ্ছেঃ ﴿وَ فِیْهَا مَا تَشْتَهِیْهِ الْاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْاَعْیُنُ١ۚ وَ اَنْتُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ﴾

'সেখানে রয়েছে সবকিছু, অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।' (৪৩ নং সূরাহ্ যুখরুফ, আয়াত নং ৭১)

﴿اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ یَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ﴾

‘তোমরা কি নিশ্চিত আছো যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেন না।’ (১৭ নং সূরাহ্ ইসরাহ, আয়াত নং ৬৮) অপর আয়াতে মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেনঃ

﴿ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُۙ۱۶ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًاؕ۱ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ﴾

তোমরা কি নিশ্চিত আছো যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না, আর এটা আকস্মিকভাবে থরথর কাঁপতে থাকবে? অথবা তোমরা নিশ্চিত আছো যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর কংকরবর্ষী ঝঞ্চা প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কি রূপ ছিলো আমার সতর্ক বাণী! (৬৭ নং সূরাহ্ মূল্ক, আয়াত নং ১৬-১৭) আরো বলা হচ্ছেঃ ﴿فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِه﴾

‘তাদের প্রত্যেককেই তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম।’ (২৯ নং সূরাহ্ ‘আনকাবূত, আয়াত নং ৪০)

উপদেশ স্বরূপ বলা হয়েছেঃ

﴿اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَۙ۲۰۵ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَۙ۲۰۶ مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ﴾

‘তুমি কি ভেবে দেখেছো আমি যদি তাদের কতক বছর ভোগ বিলাস করতে দেই, তারপর তাদের যে বিষয়ের ওয়া‘দা দেয়া হতো তা তাদের কাছে এসে পড়ে। তখন তাদের বিলাসের সামগ্রী তাদের কোন উপকারে আসবে না। (২৬ নং সূরাহ্ শু‘আরা, আয়াত নং ২০৫-২০৭)

মোট কথা, এভাবে মহান আল্লাহ কুর’আনুল হাকীমে যখন যে বিষয় তুলে ধরেছেন তাকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন। আর একে বিভিন্ন প্রকারের বাকপটুতা, ভাষালংকার এবং নিপুনতা দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। নির্দেশাবলী ও নিষেধাজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক নির্দেশের মধ্যে মঙ্গল, সততা, লাভ এবং পবিত্রতার সমাবেশ ঘটেছে, আর প্রত্যেক নিষেধাজ্ঞা পাপ হীনতা, নোংরামী এবং ভ্রষ্টতা কর্তনকারী। ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ বলেছেন যে, যখন কুর’আন মাজীদে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শুনতে পাও তখন তোমরা কান লাগিয়ে দাও, হয়তো কোন ভালো কাজের হুকুম দেয়া হবে অথবা কোন মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾

সে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে দেয় এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ ঘোষণা করে, আর তাদের ওপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে। (৭ নং সূরাহ্ আ'রাফ আয়াত নং ১৫৭)

কুর'আনুল হাকীমে আছে কিয়ামতের বর্ণনা, তথাকার ভয়াবহ দৃশ্য, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা, দয়া ও কষ্টের পূর্ণ বিবরণের সাথে সাথে মহান আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণের জন্য নানা প্রকার নি'য়ামতের বর্ণনা ও তাঁর শত্রুদের জন্য নানা প্রকার শাস্তির বর্ণনা। কোথাও বা আছে সুসংবাদ এবং কোথাও আছে ভয় প্রদর্শন। কোন স্থানে আছে সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিকরণ এবং কোন স্থানে আছে মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান। কোন জায়গায় আছে দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতার শিক্ষা এবং কোন জায়গায় আছে আখিরাতের প্রতি আগ্রহের উৎসাহ। এ সমুদয় আয়াতই মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন করে এবং মহান আল্লাহর পছন্দনীয় শারী'আতের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়, অন্তরের কালিমা দূর করে, শায়তানী পথগুলো বন্ধ করে এবং মন্দ ক্রিয়া নষ্ট করে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সর্বোচ্চ মু'জিযাহ দেয়া হয়েছে 'আল কুর'আন'

সহীহুল বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 'প্রত্যেক নবীকে (আঃ) এমন মু'জিযাহ দেয়া হয়েছিলো যা দেখে মানুষ তাদের ওপর ঈমান এনেছিলো, কিন্তু আমার মু'জিযাহ মহান আল্লাহর ওয়াহী অর্থাৎ পবিত্র কুর'আন। অতএব আমি আশা করি যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীগণের (আঃ) অপেক্ষা আমার অনুসারী বেশি হবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৬১৯, সহীহ মুসলিম ১/১৩৪) কেননা অন্যান্য নবীগণের (আঃ) মু'জিযাহ তাঁদের সাথেই বিদায় নিয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই মু'জিযাহ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। জনগণ এটা দেখতে থাকবে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকবে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীঃ 'আমার মু'জিযা ওয়াহী যা আমাকে দেয়া হয়েছে' এর ভাবার্থ এই যে, এই কুর'আনকে তাঁর জন্যেই বিশিষ্ট করা হয়েছে এবং এটা একমাত্র তাঁকেই দেয়া হয়েছে যা প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সারা দুনিয়াকে হার মানিয়ে দিয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য আসমানী কিতাব অধিকাংশ 'আলিমের মতে এই বিশেষণ হতে শূন্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ এর নাবুওয়াতের সত্যতার ওপর এবং ইসলাম ধর্মেও সত্যতার ওপর এই মু'জিযা ছাড়াও আরো এতো দালীল আছে যে, তা গুণে শেষ করা যায় না। মহান আল্লাহর জন্যেই যাবতীয় প্রশংসা।

কোন কোন ইসলামী দর্শনবিদ কুর'আন মাজীদের মু'জিযাহ হওয়ার বিষয়টি এমন পন্থায় বর্ণনা করেছেন যে, তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এবং মু'তাযিলার কথার অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা বলেন যে, হয়তো বা কুর'আন নিজেই মু'জিযাহ, এর মতো কিছু রচনা করা মানুষের সাধ্যেরই বাইরে। এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার তাদের ক্ষমতাই নেই। কিংবা যদিও এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভব এটা মানবীয় শক্তির বাইরে নয়। তথাপি তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে আহ্বান করা হচ্ছে। তারা কঠিন শত্রুতার মধ্যে রয়েছে। সত্য ধর্মকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলার জন্যে তারা সর্বশক্তি ব্যয় করতে এবং সব কিছু ধ্বংস করতে সদা প্রস্তুত রয়েছে। তবুও তারা কুর'আনুল কারীমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছে না। এটা কুর'আনের পক্ষ হতেই হচ্ছে যে, তাদের ক্ষমতা থাকা সত্তেও কুর'আন তাদেরকে বাধা দিচ্ছে যার ফলে তারা এর অনুরূপ পেশ

করতে অক্ষম হচ্ছে। যদিও শেষের মতটি পছন্দনীয় নয়। তথাপিও যদি মেনে নেয়া হয় তবে তার দ্বারাও কুর'আনের মু'জিযাহ হওয়া সাব্যস্ত হচ্ছে। এটা সত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তর্কের খাতিরে নিম্ন পর্যায়ে নেমে যাওয়া হলেও কুর'আনের মু'জিযা হওয়াই সাব্যস্ত হচ্ছে। ইমাম রাযীও ছোট ছোট সূরার প্রশ্নের উত্তরে এই পন্থায়ই অবলম্বন করেছেন।

কুর'আনের বর্ণিত 'পাথর' কি

وَقُوْدُ-এর অর্থ হচ্ছে জ্বালানী, যা দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। যেমন গাছের ডাল, কাঠ, খড়ি ইত্যাদি। কুর'আনুল হাকীমে আছেঃ ﴿وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾

সীমালঙ্ঘনকারী জাহান্নামেরই ইন্ধন। (৭২ নং সূরাহ্ জ্বিন, আয়াত নং ১৫) অন্য স্থানে আছেঃ

﴿اِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ. لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا وَ كُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾

তোমরা এবং মহান আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের 'ইবাদত করো সেগুলোতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। যদি তারা উপাস্য হতো তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতোনা; তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে। (২১ নং সূরাহ্ আম্বিয়া, আয়াত নং ৯৮-৯৯)

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, খুব সম্ভবতঃ জাহান্নামের আগুনের দাহ্য হবে মানুষ এবং পাথর। আবার এও হতে পারে যে, এর দাহ্য হবে পাথর। কিন্তু এ দুই মতামতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ ও দু'টি একে অপরের পরিপূরক। 'তৈরী করে রাখা হয়েছে' এর অর্থ হলো এটা নির্দিষ্ট করা রাখা হয়েছে যা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অস্বীকারকারীদের অবশ্যই স্পর্শ করবে। ইবনু ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেছেন যে, ইকরামাহ (রহঃ) অথবা সা'ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঐ শাস্তি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে সেই সব অবিশ্বাসীদের জন্য যারা অন্যান্য অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করেছে। (তাফসীর তাবারী ১/৩৮৩)

এখানে এর অর্থ হচ্ছে গন্ধকের পাথর যা অত্যন্ত কালো, বড় এবং দুর্গন্ধময়, যার আগুনে অত্যন্ত তেজ থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা হতে উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ পাথরগুলো যেগুলোর ছবি ইত্যাদি বানানো হতো, অতঃপর ঐগুলোকে পূঁজা করা হতো। যেমন এক জায়গায় আছেঃ

﴿إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾

তোমরা এবং মহান আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ‘ইবাদত করো সেগুলোতো জাহান্নামের ইন্ধন। (২১ নং সূরাহ্ আম্বিয়া, আয়াত নং ৯৮)

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এবং ইমাম রাযী (রহঃ) এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, গন্ধকের পাথরে আগুন ধরা কোন নতুন কথা নয়। কিন্তু এই যুক্তিটি সুদৃঢ় নয়। কেননা যখন গন্ধকের পাথর দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। তখন এটা জানা কথা যে, এর তাপ ও প্রখরতা সাধারণ আগুন হতে বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তার জ্বাল, স্ফীতি এবং শিখাও খুব বেশি হবে। তাছাড়া পূর্ববর্তী মনিষীগণ এটাই বর্ণনা করেছেন। এরকমই পাথরগুলোতে আগুন লাগাও সর্বজন বিদিত এবং আয়াতের উদ্দেশ্যও হচ্ছে আগুনের তেজ এবং স্ফীত বর্ণনা করা, আর এটা বর্ণনা করার জন্যও পাথরের অর্থ গন্ধকের পাথর মনে করাই বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা আগুনও তেজী হবে আর শাস্তিও কঠিন হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

‘যখনই তার আগুন নিস্তেজ হয়ে আসবে, আমি তাদের জন্য অগ্নির দহন শক্তি বৃদ্ধি করে দিবো।’ (১৭ নং সূরাহ বানী ইসরাঈল, আয়াত নং ৯৭) একটি হাদীসে আছে মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ كل مؤذ في النار

‘প্রত্যেক কষ্টদায়ক জিনিস আগুনে আছে।’ (হাদীসটি ইমাম আলবানী স্বীয় য‘ঈফুল জামি‘তে উল্লেখ করে বলেছেন, এটা একটি মাওযূ হাদীস) কিন্তু হাদীসটি সহীহ নয়। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, এর দু’টো অর্থ আছে। একটি এই যে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি জাহান্নামী যে অপরকে কষ্ট দেয়। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, প্রত্যেক কষ্টদায়ক জিনিস আগুনে বিদ্যমান থাকবে যা জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দিবে।

জাহান্নাম কী এখনও বর্তমান?

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কুফরীর ওপর রয়েছে তার জন্যও ঐ শাস্তি তৈরী আছে। এই আয়াত দ্বারা এই দালীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, জাহান্নাম এখনও বিদ্যমান ও সৃষ্ট রয়েছে। কেননা أُعِدَّتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দালীল স্বরূপ বহু হাদীসও রয়েছে। একটি সুদীর্ঘ হাদীসে আছে, জান্নাত ও জাহান্নামের তর্ক হলো লম্বা হাদীসের একটি অংশ নিম্নরূপঃ

اِسْتَاذَنَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ.

‘জাহান্নাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট আরয করলোঃ হে আমার রাব্ব! আমার এক অংশ অন্য অংশকে গ্রাস করছে। সুতরাং তাকে শীতকালে একটি এবং গ্রীষ্মকালে একটি শ্বাস নেয়ার অনুমতি দেয়া হলো।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ৫২৭, তিরমিযী ৭/৩১৭। গ্রন্থকার إستاذنت দ্বারা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থে শব্দটি اشتكت এসেছে)

‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) বলেনঃ ‘আমরা একদিন একটি বড় শব্দ শুনতে পাই। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করিঃ ‘এটা কিসের শব্দ?’ তিনি বলেনঃ

هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها

‘সত্তর বছর পূর্বে একটি পাথর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, আজ সেখানে পৌঁছেছে।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম ৪/২১৮৪) চতুর্থ হাদীস এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য গ্রহণের সালাত আদায় করা অবস্থায় জাহান্নামকে দেখেছিলেন। পঞ্চম হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মি‘রাজের রাতে জাহান্নাম ও তার শাস্তি অবলোকন করেছিলেন। এরকমই আরো অনেক সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীস রয়েছে।

মু‘তাযিলারা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এটা অস্বীকার করে থাকে। আর কাযী উনদুলুস মুনযির ইবনু সা‘ঈদ বালুতীও তাদের অনুকরণ করেছেন।

একটি সাবধানতা

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ‘তোমরা তার মতো কোন সূরাহ্ এনে দাও।’ এখানে ‘কোন সূরাহ’ একটি ব্যপক অর্থবোধক, যা লম্বা অথবা ছোট সব সূরাহকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

ইমাম রাযী (রাঃ)-এর তাফসীরে বলেন, কেউ যদি বলে যে, সূরাহ কাওসার, সূরাহ ‘আসর এবং সূরাহ আল কাফিরুনের মতো ছোট ছোট কিংবা এর সমপর্যায়ের কোন সূরাহ রচনা করা সম্ভব, সুতরাং একে মানবীয় শক্তির বাইরে বলা নেহায়েত হঠধর্মী ও অহেতুক পক্ষপাতিত্ব করারই নামান্তর। তাহলে এর উত্তরে আমরা বলবো যে, আমরা তো কুর’আন মাজীদের মু‘জিযাহ হওয়ার দু’টি পন্থা উল্লেখ করেছি কিন্তু দ্বিতীয় পন্থাকে পছন্দ করার কারণ হলো, আমরা বলি যদি এই ছোট সূরাহ গুলোও ভাষার সৌন্দর্য ও অলংকারের দিক দিয়ে এরকমই হয় যে, সেগুলোকেও মু‘জিযাহ বলা যেতে পারে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব না হয়, তবে তো আমাদের উদ্দেশ্য লাভ হয়েই গেলো। কেননা এরূপ সূরাহ রচনা মানুষের সাধ্যের মধ্যে হওয়া সত্তেও তারা এরূপ সূরাহ রচনা করতে পারছে নাÑএটা একথারই দালীল যে, ছোট ছোট আয়াতগুলোসহ সম্পূর্ণ কুর’আনই

মু'জিযাহ। এটা তো ইমাম রাযী (রহঃ)-এর কথা। কিন্তু সঠিক কথা এই যে,প্রকৃত পক্ষে কুর'আনুল কারীমের ছোট বড় প্রত্যেকটি সূরাহ মু'জিযাহ এবং মানুষ এর অনুরূপ রচনা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম ও ব্যর্থ।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন যে, মানুষ যদি গভীর চিন্তা সহকারে শুধুমাত্র সূরাহ 'আল 'আসর'কে বুঝবার চেষ্টা করে তাহলেই যথেষ্ট। এ বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। আর তা হলো, 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে প্রতিনিধি হিসেবে মুসাইলামা কায্যাবের নিকট উপস্থিত হলে সে তাকে জিজ্ঞেস করেঃ 'তুমি তো মাক্কা থেকেই এসেছো, আচ্ছা বলতো আজকাল কোন নতুন ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে?' তিনি বললেনঃ সম্প্রতি একটি সংক্ষিপ্ত সূরাহ্ অবতীর্ণ হয়েছে যা অত্যন্ত চারুবাক ও ভাষার সৌন্দর্য ও অলংকারে পরিপূর্ণ এবং খুবই ব্যাপক।' অতঃপর সূরাহ্ আল-'আসর পড়ে শুনান। মুসাইলামা কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলেঃ 'আমার ওপরও এ রকমই একটি সূরাহ্ অবতীর্ণ হয়েছে।' তিনি বলেনঃ 'ঠিক আছে, শুনাও তো দেখি।' সে বলেঃ

يا وبْر يا وبْر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر فقر

'ওহে জংলী বিড়াল! তোমার অস্তিত্ব তো দু'টি কান ও বক্ষ ছাড়া অন্য কিছুই নয়, বাকী তো তোমার সবই নগণ্য।' অতঃপর সে বলেঃ হে 'আমর! কেমন হয়েছে বলে তুমি মনে করো? 'আমর (রাঃ) বললেনঃ 'আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? তুমি তো ভালো করেই জানো যে, তোমার এ সবই মিথ্যা তা আমি জানি। কোথায় এ বাজে কথা, আর কোথায় সেই জ্ঞান ও দর্শনপূর্ণ বাণী।'

আল্লাহ তা'আলা তাওহীদের আলোচনা করার পর এখানে নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি কাফিরদের সম্বোধন করে বলেন:

(وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ)

"এবং আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমরা যদি সন্দিহান হও, তবে তার সমতুল্য একটি 'সূরা'তৈরি করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে আহ্বান কর; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

এখানে "عبد" (আবদ) বা বান্দা দ্বারা উদ্দেশ্য নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

অন্যএ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلٰي مُحَمَّدٍ)

"আর তারা ঈমান আনে যা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:২)

সুতরাং এখানে عبد (আবদ) দ্বারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বুঝানো হয়েছে। আর "আবদ" হল একটি অধিক সম্মানসূচক উপাধি। কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে "আবদ"বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلٰي عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ)

"যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহর ওপর এবং যা মীমাংসার দিন আমি আমার বান্দার (মুহাম্মাদের) প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম তার ওপর।" (সূরা আনফাল ৮:৪১)

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرٰي بِعَبْدِهٖ)

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে (মুহাম্মাদকে) রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১)

এভাবে সূরা ফুরকান ১, সূরা নাজম ১০, সূরা হাদীদ ৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে عبد (আবদ) বা দাস বলে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার বান্দা বা দাস, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্রষ্টা ও মা'বূদ।

এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে পছন্দ করেন তাদের ব্যাপারে এ উপাধি ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

(فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ)

"তবে তার সমতুল্য একটি 'সূরা'তৈরি করে নিয়ে এসো"

কাফিররা যখন কুরআনকে পূর্বকালের উপকথা বা মুহাম্মাদের কথা বলে প্রত্যাখ্যান করতে লাগল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন, এ কুরআনের মত একটি কিতাব রচনা করে নিয়ে আসতে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

(لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا)

"যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য সব মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এটার অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না।" (সূরা ইসরা ১৭:৮৮)

তারা যখন এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারল না তখন আল্লাহ তা'আলা দশটি সূরার মত কিছু তৈরি করে আনতে বললেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيَاتٍ)

"তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন করো।" (সূরা হূদ ১১:১৩)

এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একটি সূরার কথা বলেও চ্যালেঞ্জ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ)

– এর সমতুল্য একটি মাত্র সূরা নিয়ে এসো। (সূরা বাকারাহ ২:২৩)

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৪

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِیْنَ

কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো আর নিঃসন্দেহে কখনই তোমরা এটা করতে পারবে না, তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা তৈরি রাখা হয়েছে সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য।

২৪ নং আয়াতের তাফসীর:

এটা কুরআনের বিশেষ মু'জিযা। একমাত্র কুরআনই নিঃসংকোচে সর্বকালের জন্য নিজ স্বীকৃত সত্তার এভাবে ঘোষণা দিতে পারে। যেভাবে রাসূলের যুগে কেউ এ কুরআনের মত আনতে পারে নি। তেমনি কুরআন এ ঘোষণাও নিঃশঙ্ক ও নিঃসংকোচে দিতে পেরেছে যে, যুগের পর যুগের জন্য, কালের পর কালের জন্য এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হচ্ছে যে, এ কুরআনের মত কোন কিতাব কেউ কোন দিন আনতে পারবে না। অনুরূপই ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। রাসূলের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এ কুরআনের মত কিছু আনার দুঃসাহস দেখাতে পারে নি। আর কোনদিন পারবেও না। গোটা বিশ্বের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর কথার সমকক্ষ কোন কথা কি কোন সৃষ্টির পক্ষে আনা সম্ভব?

ইবনে কাসীর বলেন, এখানে 'পাথর' দ্বারা কালো গন্ধক পাথর বোঝানো হয়েছে। গন্ধক দিয়ে আগুন জ্বালালে তার তাপ ভীষণ ও স্থায়ী হয়। আসমান যমীন সৃষ্টির সময়ই আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের জন্য তা সৃষ্টি করে প্রথম আসমানে রেখে দিয়েছেন। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে ঐ সমস্ত পাথর উদ্দেশ্য, যেগুলোর ইবাদাত করা হয়েছে। [ইবনে কাসীর] আর জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ এক ভাগ দিয়ে শাস্তি দিলেই তো যথেষ্ট হতো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জাহান্নামের আগুন তোমাদের আগুনের তুলনায় উনসত্তর গুণ বেশী উত্তপ্ত "[বুখারী ৩২৬৫, মুসলিম: ২৪৮৩]

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হচ্ছে, জাহান্নাম কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এখানে (اعِدَّ) এর সর্বনামটির ইঙ্গিত সুস্পষ্টতই মানুষ ও পাথর দ্বারা প্রজ্জ্বলিত জাহান্নামের দিকে। অবশ্য এ সর্বনামটি পাথরের ক্ষেত্রেও হতে পারে। তখন অর্থ দাঁড়ায়, পাথরগুলো কাফেরদের শাস্তি প্রদানের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উভয় অর্থের মধ্যে বড় ধরনের কোন

তফাৎ নেই। একটি অপরটির পরিপূরক ও পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আগুন বিহীন যেমন পাথর জ্বলে না, তেমনি পাথর বিহীন আগুনের দাহ্য ক্ষমতাও বাড়ে না। সুতরাং উভয় উপাদানই কাফেরদের কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

আয়াতের এ অংশ দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণ দলীল নেন যে, জাহান্নাম বর্তমানে তৈরী করা অবস্থায় আছে। জাহান্নাম যে বাস্তবিকই বর্তমানে রয়েছে তার প্রমাণ অনেক হাদীস দ্বারা পাওয়া যায়। যেমন, জাহান্নাম ও জান্নাতের বিবাদের বর্ণনা সংক্রান্ত হাদীস [বুখারী ৪৮৪৯, মুসলিম: ২৮৪৬]

জাহান্নামের প্রার্থনা মোতাবেক তাকে বছরে শীত ও গ্রীষ্মে দুই বার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের অনুমতি প্রদানের বর্ণনা [বুখারী ৫৩৭, মুসলিম: ৬৩৭]

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এক হাদীসে আছে, "আমরা একটি বিকট শব্দ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার কারণ জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, এটা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত পাথর জাহান্নামে পতিত হওয়ার আওয়ায। " [মুসলিম: ২৮৪৪, মুসনাদে আহমাদ ২/৪৭১] তাছাড়া সূর্যগ্রহণের সালাত এবং মিরাজের রাত্রির ঘটনাবলীও প্রমাণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টিই তৈরী করে রাখা হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

এখানে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ সেখানে দোজখের ইন্ধন কেবল তোমরা একাই হবে না বরং তোমাদের সাথে থাকবে তোমাদের ঠাকুর ও আরাধ্য দেবতাদের সেই সব মূর্তি যাদেরকে তোমরা মাবুদ ও আরাধ্য বানিয়ে পূজা করে আসছিলে। তখন তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে খোদায়ী করার ও উপাস্য হবার ব্যাপারে এদের অধিকার কতটুকু।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

(فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ)

"তা হলে তোমরা সেই জাহান্নামকে ভয় কর যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর যা তৈরি করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।" (সূরা বাকারাহ ২:২৪)

আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অবান্তর চিন্তা-ভাবনা ও অপকৌশল পরিহার করে সে জাহান্নামকে ভয় করার নির্দেশ দিলেন যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।

"وُقُوْدٌ" এর অর্থ হচ্ছে জ্বালানি, যা দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। যেমন গাছের ডাল, কাঠ ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَأَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا)

"অপরপক্ষে অত্যাচারীরা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন হবে।" (সূরা জিন ৭২:১৫)

এখানে الحجارة (হিজারা) বা পাথর দ্বারা উদ্দেশ্য গন্ধকের পাথর যা অত্যন্ত কাল, বড় এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। যার আগুন অত্যন্ত উত্তপ্ত হবে।

ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন: এটা গন্ধকের পাথর যা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাফিরদের জন্য এগুলো প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। (তাফসীর ইবনু জারীর আত-তাবারী, অত্র আয়াতের তাফসীর, বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুপাতিক)

সুদ্দী স্বীয় সনদে ইবনু মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন যে, জাহান্নামে গন্ধকের পাথর থাকবে যার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দ্বারা কাফিরদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন: এ পাথরগুলোর দুর্গন্ধ মৃত দেহের দুর্গন্ধের চেয়েও কঠিন দুর্গন্ধময়।

আবার কেউ বলেছেন: এগুলো হল সেই সব মূর্তি, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার হিসেবে ইবাদত করা হত। যাতে মুশরিকরা বুঝতে পারে তারা এসব মূর্তির ইবাদত করেছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য। কিন্তু সেগুলো কোন উপকার করা তো দূরের কথা, আজ তাদের সাথে জাহান্নামে জ্বলছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ)

“তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ‘ইবাদত করো সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সকলে তাতে প্রবেশ করবে।। যদি তারা ইলাহ্ হতো তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না; তাদের সকলেই তাতে স্থায়ী হবে।” (সূরা আম্বিয়া ২১:৯৮-৯৯)

(أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ)

“তৈরি করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।”থেকে বুঝা যাচ্ছে মূলত জাহান্নাম কাফির ও মুশরিকদের জন্য, কোন মু’মিন সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে না। আরো বুঝা যাচ্ছে জান্নাত এবং জাহান্নামের অস্তিত্ব এখনো বিদ্যমান।

হাফেয ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন: এ আয়াত দ্বারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জমায়াতের ইমামগণ দলীল পেশ করে থাকেন যে, জাহান্নাম এখনো বিদ্যমান।

এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। যেমন একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে:

تَحَاجَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ

জান্নাত ও জাহান্নাম ঝগড়া করল। (সহীহ বুখারী হা: ৪৮৫০)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: জাহান্নাম তার রবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলল: হে আমার প্রতিপালক! আমার কিছু অংশ কিছু অংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন তাকে দু’টি শ্বাস ছাড়ার অনুমতি দেয়া হল। একটি শীতকালে এবং অপরটি গ্রীষ্মকালে। (সহীহ বুখারী হা: ৩২৬০)

ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক সময় আমরা একটি প্রকট আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমরা বললাম: এটি কী? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সত্তর বছর পূর্বে একটি পাথর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তা আজ পৌঁছল। (সহীহ মুসলিম হা: ২১৮৪-২১৮৫)

এরূপ অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা প্রমাণ করে জান্নাত ও জাহান্নাম এখনো বিদ্যমান। এটাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর আক্বীদা-বিশ্বাস।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. তৎকালীন আরবরা সাহিত্যে বিশ্ব-সেরা ছিল। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এ কুরআনের সবচেয়ে একটি ছোট সূরার মত সূরা তৈরি করে আনতে। কিন্তু তারা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারেনি। এ চ্যালেঞ্জ কিয়ামত অবধি সকল মানুষের জন্য বিদ্যামান থাকবে।

২. আবদ বা দাস একটি সম্মানসূচক উপাধি। আল্লাহ তা'আলা কেবল তাদের জন্য এ উপাধি ব্যবহার করেন যাদের তিনি ভালবাসেন।

৩. জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এখনো বিদ্যমান।

৪. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল; তাঁর কোন অংশ নয়।